51

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 MAR 1996
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

স্কুল-কলেজের বর্ধিত খরচ

মোকাম্মেল হক শিবলু

সন্তানকে লেখাপড়া শিখাতে গিয়ে অভিভাবকের খরচ দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে। ভর্তি সমস্যা তো আছেই, ভর্তি হওয়ার পর স্কুল-কলেজের ভর্তি ফি, বেতন, অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ জোগানোও এখন অভিভাবকদের বড় চিন্তার বিষয়। অর্থাৎ সন্তানকে পড়ালেখা শেখানোটাও তাঁর নিজের কাছে দায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে। যেন সন্তানকে শিক্ষাঙ্গনে পাঠিয়ে তিনি বড় অন্যায় করে ফেলেছেন; আর তারই শাস্তিস্বরূপ তাঁর কাঁধে চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে ব্যয়ের বিরাট বোঝা। সন্তান শিক্ষাঙ্গন থেকে না বের হওয়া পর্যন্ত তার এ বোঝা থেকে মুক্তি নেই। এখানে এমন কিছু খরচের কথা তুলে ধরা হলো, যা অনেক স্কুল-কলেজের অর্থ উপার্জনের একটা রাস্তা। যেমন—

খাত	ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ	
১। সংস্কৃতি	২৫-২০০	টাকা
২। ধর্ম ও সমাজকল্যাণ	২০-৮০	"
৩। ম্যাগাজিন	২০-৬০	"
৪। ক্রীড়া	২০-১৫০	"
৫। দরিদ্র ফি	১৫-১৫০	"

ঢাকাসহ সারা দেশে এখন প্রচুর বেসরকারী স্কুল-কলেজ-কিন্ডারগার্টেন গড়ে উঠেছে। বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোগে বেশিরভাগ স্কুল-কলেজেরই অবস্থান সামান্য খোলা স্থানবিহীন ইটের ভবনের ভিতর। স্কুল-কলেজটির পাশের ভবনটিই হয়ত গার্মেন্টস কিংবা নিচের তলাতেই হয়ত দোকানপাট। এসব স্কুল-কলেজে যেন মুক্তবায়ুর প্রবেশ নিষেধ। অনেক সরকারী স্কুল-কলেজসহ এসব বেসরকারী শিক্ষালয়ে খেলাধূলা একেবারে হয়-ই না। আর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্ম ও সমাজকল্যাণমূলক কাজকর্ম, ম্যাগাজিন প্রকাশও একেবারে হয় না বললেই চলে।

প্রায় সব স্কুল-কলেজেই দরিদ্র ফি নামে একটা খাত আছে। প্রচুর অর্থ উপার্জন করে স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষ এ খাতের মাধ্যমে। কিন্তু যে বিষয়টিকে ইস্যু করে এ খাতটি সৃষ্টি করা হয় তা মোটেও পালন করা হয় না। খুব কম দরিদ্র ছাত্রই এ খাত থেকে অর্থ পায়।

উল্লিখিত খাতগুলো ছাড়াও অনেক স্কুল-কলেজে আরও কিছু কিছু খাত আছে যেগুলো ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষাঙ্গনে খুব একটা দেখতে পায় না। যেমন পাঠাগার ফি। এই ফি নিয়মিত দিয়ে গেছে। কিন্তু পাঠাগারের গেটে তালা দেখেই নিজ সেশন পার করে ফেলেছে— এমন ছাত্র-ছাত্রী আমাদের দেশে মিলবে অসংখ্য। আর পাঠাগার যদি খোলাও পাওয়া যায়, প্রয়োজনীয় বই পাওয়া ভার। যে বই-ই খুঁজতে যাওয়া যাক না কেন, লাইব্রেরিয়ানের 'নেই' বা 'আরেক জন নিয়ে গেছে' জাতীয় বাক্যই শোনা যায় বেশি। এছাড়া নোট বইয়ের সংখ্যাও থাকে খুবই নগণ্য।

এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রীরা কোন সুফল পায় না। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষকে দেয় এমন কতগুলো ব্যয় হচ্ছে— ল্যাবরেটরি ফি, বিবিধ ফি, রোভার স্কাউট ফি, কমনরুম ফি, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা ফি ইত্যাদি। শিক্ষাঙ্গনে এসবের কোন অস্তিত্ব না থাকলেও অভিভাবককে এসবের জন্য খরচ বহন করতে হয়। অনেক কলেজেই পরীক্ষা হয় না। তদুপরি অভিভাবককে পরীক্ষার ফি, প্রশংসাপত্র ফি, ধারণ ফি নিয়মিত দিয়ে যেতে হয়।

অনেক কলেজে শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ তহবিলও আছে। স্কুল-কলেজ উন্নয়ন ফি'র পাশাপাশি এই ফি'টাও অভিভাবককে বহন করতে হয়। কিন্তু এই তহবিলের দ্বারা শিক্ষকের কোন উন্নয়ন হয় বলে মনে হয় না। অনেক বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের অভিযোগ— তাঁরা নিয়মিত বেতন পান না। কোন কোন মাসে পান অর্ধেক বা এক-চতুর্থাংশ বেতন। এমনও শোনা গেছে, সাত মাস যাবত কোন বেতনই পাননি।

এতো গেল তহবিল সংক্রান্ত ভার। এছাড়াও অভিভাবককে বহন করতে হয় আরও কিছু অলিখিত খরচ, যেগুলোর জন্য স্কুল বা কলেজ থেকে কোন রসিদ সরবরাহ করা হয় না। সরকারী কলেজের পাশাপাশি বেসরকারী কলেজেও এরূপ খরচের ভার বহন করতে হয় শিক্ষার্থীর অভিভাবককে। অনেক অভিভাবক এ ধরনের খরচের কথা বিশ্বাসও করতে চান না। ধরে নেন, সন্তানই বুঝি টাকা হাতানোর একটা পথ সৃষ্টি করছে। আসলে তা নয়; শিক্ষার্থী মাত্রই জানেন, কলেজের অফিস রুমে বেতন দিতে গিয়ে যদি কেউ পঞ্চাশ বা এক শ' টাকার নোট দেয় তবে 'ভাংতি নেই'-এর অজুহাতে খুচরা টাকাটা ফেরত পাবে না। দ্বিতীয় বর্ষে ওঠার সময় কেরানিদেরকে 'চা খাওয়ার' জন্য দিতে হয় পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ টাকা। ছাত্র-ছাত্রীরা চক্ষুলজ্জায় বা কেরানিদের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখার জন্য এ ব্যয়টা করেও ফেলে।

এছাড়াও কেরানিরা কলেজ থেকে বেরুনোর সময় অর্থাৎ দ্বিতীয় বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষার জন্য ফরম পূরণ করার সময় নেয় পঞ্চাশ থেকে এক শ' টাকা। এটা নেয়া হয় 'চলেই তো যাচ্ছেন, আমাদের জন্য শেষ দোয়াটা করবেন না!'— এই অজুহাতে। কিন্তু 'শেষ দোয়া' এখানেই দাঁড়িয়ে থাকে না; মার্কশীট, সার্টিফিকেট তোলার সময়ও প্রতিটির জন্য পঞ্চাশ থেকে দু' শ' টাকা করে গুনতে হয়। আর অন্যান্য কাগজপত্র তৈরি করা ও বের করা, সেনা কল্যাণ তহবিলের টাকা তোলা, অধ্যক্ষের স্বাক্ষর সংগ্রহ করার ব্যাপারে খরচ তো আছেই।

শিশুদের লেখাপড়ার ব্যয় প্রতিদিন বেড়ে চলেছে

এ ধরনের খরচগুলো শুধু কলেজেই নয়; বিশ্ববিদ্যালয়েও বহন করতে হয়। স্কুলের ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদেরও বহন করতে হয়। বৃত্তির টাকা তুলতে গিয়ে, নবম শ্রেণীতে রেজিস্ট্রেশন ফরম আনতে গিয়ে, এসএসসি'র মার্কশীট, সার্টিফিকেট তুলতে গিয়ে তাদের এ অভিজ্ঞতা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বই তুলতে গিয়েও তারা নোংরা অভিজ্ঞতার স্বীকার হয়।

এসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনেক শিক্ষকও জড়িত থাকেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে একজন বা দু'জন শিক্ষকও অনেক সময় একটা রসিদ ধরিয়ে দেন ছাত্র-ছাত্রীদের। মার্কশীট, সার্টিফিকেট তোলার সময়ই এটা করা হয়। দেশের বড় কলেজগুলো এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নতুন নতুন গজে ওঠা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ও এ ধারা রপ্ত করছে। শিক্ষার্থীর অভিভাবককে শোষণ করাই যেন তাদের কাজ। আর কিছু না হোক, অর্থ আদায়ের রসিদটাই এ জন্য তাঁরা ঠিকভাবে ছাপান এবং ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে অর্থ আদায় করে নেন। বিনিময়ে ঐ রসিদটা ছাড়া তেমন কিছু দেন না।

এ ধরনের ব্যয়, যা দিন দিন বাড়ছে তা অভিভাবকরা কোথেকে জোগাবেন?